দশ বছর আগে পরে

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

প্রথমে মনে হয়েছিল পুরো ব্যাপারটাই হাস্যকর। একটা লঘু ভুল। কিংবা কারুর রসিকতা।

সকাল ন-টা। প্রতিদিন এই সময় ইন্দ্রনাথ বসু তানপুরা নিয়ে রেওয়াজ করেন ঘন্টা দু-এক। তিনি রাতচরা পাখির মতন ঘুমোতে যান তৃতীয় প্রহরে, তাই ভোরবেলা ওঠা হয় না। ভোরবেলা গলা সাধার পক্ষে প্রশস্ত, এটাই প্রথাসিদ্ধ।

এই সময় ইন্দ্রনাথ কোনো বহিরাগতের সঙ্গে দেখা করেন না। তাঁর স্ত্রী কৃষ্ণা ছাড়া বাড়ির অন্য কেউ আসতে সাহস করে না তাঁর ঘরে। চা - ও খান না, শুধু এক গেলাস কাঁচা বেলের সরবত।

কৃষ্ণা দু-বার কিছু বলতে চেয়েছিল, ইন্দ্রনাথ হাত তুলে থামিয়ে দিয়েছেন। তিনি আলাহিয়া বিলাবল রাগে তান ধরেছেন, এ - সময় মনঃসংযোগ নষ্ট করলে চলে না।

একবার সরবতের গেলাশে একটু চুমুক দেবার জন্য থামতেই কৃষ্ণা মুখ বাড়িয়ে বলল,

— লোকটাকে পাগল মনে হচ্ছে।

ইন্দ্রনাথের ভুরু কুঁচকে গেল। সকালবেলা পাগল - সমাচার।

কৃষ্ণা আবার বলল, — যতবার বলছি দেখা হবে না, ততবারই বলছে, তোমার সঙ্গে দেখা না করে যাবে না। ভেতরে ঢুকতে দিইনি, ঠায় দাঁড়িয়ে আছে দরজার কাছে। আমাকে কিছু বলতে রাজি নয়।

ইন্দ্রনাথ বললেন, — আমি সাড়ে ন-টার আগে উঠছি না। ততক্ষণ যদি দাঁড়িয়ে থাকতে চায় থাক।

এইটুকু কথা বলার জন্যই তাঁর মনটা খানিকটা চঞ্চল হয়ে গেল।

মিনিট কুড়ি পরেই তিনি উঠে পড়লেন।

দরজার বাইরে নয়, লোকটিকে এখন বসানো হয়েছে ভেতরে। প্যান্ট - শার্ট পরা সাধারণ চেহারার যুবক। নিশ্চয়ই জল খেতে চেয়েছিল। গৃহস্থবাড়ির কেউ খাবার জল চাইলে তাকে দরজার বাইরে জল দেওয়াটা খুবই অশোভন।

যুবকটির দিকে একঝলক তাকিয়েই ইন্দ্রনাথ বুঝে গেলেন, এ - তাঁকে কোনো ফাংশানে আমন্ত্রণ জানাবার জন্য আসেনি। তিনি উচ্চাঙ্গ সংগীতের গায়ক, সাধারণ জলসায় তাঁর ডাক পড়ে না। যারা তাঁকে ডাকে তাদের চেহারা অন্যরকম হয়।

এখন বাথরুমের কমোডে বসে ইন্দ্রনাথের কাগজ পড়ার সময়।

তিনি লম্বা - চওড়া পুরুষ ইদানীং পঞ্চাশ বছর বয়েস হয়ে যাবার পর শরীরটা একটু ভারীর দিকে ঝুঁকেছে।

ছেলেটির সামনে দাঁড়িয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, — কী বলবে, বলো। অনেকক্ষণ এসেছ শুনলাম।

ছেলেটিকে দেখে পাগল বলে মনে করার কোনো আপাত কারণ নেই। কৃষ্ণা কেন সেরকম ভেবেছে কে জানে। মুখ নিচু করে সে লাজুকভাবে নখ খুঁটছে। কোনো উত্তর দিল না।

ইন্দ্রনাথ আবার জিজ্ঞেস করলেন, — কী ব্যাপার?

ছেলেটি এবার নিচু গলায় বলল, —মানে, ঠিক বুঝতে পারছি না, মানে, স্যার আপনি...

ছেলেটি বাক্যের মাঝখানে থেমে যেতেই ইন্দ্রনাথ ভাবলেন, নিশ্চয়ই কিছু সাহায্য চাইতে এসেছে। এরকম আসে মাঝে মাঝে। কোনো গ্রাম্য গায়ক কোথাও একটা সুযোগ করে দেবার জন্য অনুরোধ জানায়।

ছেলেটি এবার মুখ তুলে বলল, — স্যার, আপনি আমার জামাইবাবু।

ঠিক শুনতে না পেয়ে কিংবা বুঝতে না পেরে তিনি বললেন, — কী?

ছেলেটি আবার বলল, — আপনি আমার জামাইবাবু।

ইন্দ্রনাথ সারা মুখে হাসি ছড়িয়ে বললেন, —তাই নাকি? তুমি আমার শালা? সে-কথা আগে বলোনি কেন?

তিনি হাঁক দিলেন, — কৃষ্ণা, কৃষ্ণা, একবার শোনো তো!

কৃষ্ণা আসতেই তিনি কৌতুক করে বললেন, — এ তোমার ভাই, তুমি চিনতে পারোনি? এই শালাবাবুটিকে তো আমি আগে দেখিনি।

কৃষ্ণা ইন্দ্রনাথের চেয়ে তেরো বছরের ছোটো। এখনো তন্বী ও রূপসী। একসময় ইন্দ্রনাথের গানের ছাত্রী ছিল, এখন গান ছেড়ে দিয়ে দুই ছেলেমেয়ে নিয়েই নিমগ্ন।

কৃষ্ণা কিছু বলার আগেই ছেলেটি আবার বলল, —ইনি নন, আপনি আমার নিজের দিদিকে বিয়ে করেছেন।

এবারে অট্টহাসি করে উঠে ইন্দ্রনাথ বললেন, — আর একটা বিয়ে? এই এক বউকেই সামলাতে পারি না। তোমার দিদিকে আমি কবে বিয়ে করলাম ভাই?

গত মাসে!

গত মাসে? তা কোথায় বিয়েটা হল? তোমাদের বাড়ি কোথায়?

আমাদের বাড়ি কামালগাজি। বিয়েটা হয়েছে পুরীতে।

এবারে একটা সোফায় বসে পড়ে গলা তুলে বললেন, — রতন, আমার চা-টা এখানে দিয়ে যা।

ছেলেটিকে তিনি বললেন, — আমার ইচ্ছে থাকলেও, একজন বউ বেঁচে থাকতে তো আর একটা বিয়ে করা যায় না। আর আমি দশ বছর পুরী যাইনি। তুমি তাই ভুল জায়গায় এসেছ।

কৃষ্ণা দুষ্টুমি করে বলল, — কেন দুটো বিয়ে করা যাবে না? কেউ কেউ তো লুকিয়ে দিব্যি বিয়ে করে। হিন্দি ফিল্মের কোন নায়ক

যেন...। কাগজেও তো মাঝে মাঝেই পড়ি।

ইন্দ্রনাথ বললেন, — তারা কি আমার মতন আসল বউকে এত ভয় পায়?

কৃষ্ণা বললেন, — আহা-হা!

ইন্দ্রনাথ ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করলেন, — তোমার এই জামাইবাবুটির নাম কী?

ছেলেটি বলল, — ইন্দ্রনাথ বসু।

— তিনি কী করেন?

— গান করেন স্যার।

— বটে! জানতাম না, আমার নামে আর একজন গায়ক আছে। তুমি বিয়ের সময় সেখানে ছিলে? তুমি তাকে দেখেছো?

— বিয়ের সময় ছিলাম না, কিন্তু ফটো দেখেছি। দিদির সঙ্গে পুরীর মন্দিরের পাশে।

— সেটা কার ছবি? আমার?

— হ্যাঁ, স্যার

— দশ বছর। মানে এই টুয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুরিতেই আমি পুরী যায়নি, অথচ গত মাসে সেখানকার মন্দিরের পাশে আমার ছবি উঠে গেল? একী ম্যাজিক নাকি?

কৃষ্ণা চোখ পাকিয়ে বলল, — তুমি যে গত মাসে পুরী যাওনি, তা আমরা কী করে বিশ্বাস করব? তুমি এলাহাবাদ মিউজিক কনফারেন্সে গেলে। সত্যিই এলাহাবাদ গিয়েছিল, না তার বদলে টুক করে পুরী ঘুরে এলে, তা আমরা জানব কী করে?

ইন্দ্রনাথ কৃত্রিম দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, —স্বামীর প্রতি এমন অবিশ্বাস! সতী - সাধ্বী নারীর একী ব্যবহার! তা হলে কি আমি কাগজওয়ালাদেরও হাত করে ফেলেছি? ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসে এলাহাবাদ ফ্যংশনে আমার গানের প্রশংসা বেরুল কী করে?

কৃষ্ণাও ঝগড়ার ভঙ্গি করে বলল, — খবরের কাগজের কথা আর বোলো না। শুঁড়ির সাক্ষী মাতাল!

— তোমার দাদা অতবড়ো কাগজের নিউজ এডিটার, তুমি তাকেও মাতাল বললে?

— আমার দাদা যে বিখ্যাত মাতাল, তা সবাই জানে! একবার জ্যোতি বসুর একটা মিটিং -এ যাবার কথা ভুলে গিয়ে বসে ছিল পার্ক স্ট্রিটের একটা বারে। তারপর অন্যদের কাছ থেকে শুনে নিয়ে সেই মিটিং -এর রিপোর্ট লিখে দিল, মনে নেই? জ্যোতিবাবু নিজেই ফোন করে জানিয়েছিলেন, 'সোমেনকে তো আমি দেখিনি। সে আমাকে ওই প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করল কখন?'

— এদেরই বলে ধূরন্ধর সাংবাদিক! যাই হোক, ওহে শালাবাবু, ধরা যাক আমি তোমার দিদিকে গোপনে বিয়ে করেছি। তুমি আজ এসেছ ঠিক কি জন্য? কাছাকাছি তো জামাইষষ্ঠী নেই।

যুবকটি বলল, — পুরী থেকে ফেরার পর আপনি দিদির কোনো খোঁজখবর করেননি। আপনি বলেছিলেন, আপনাকে একবার এর মধ্যে বহরমপুর যেতে হবে, তারপর ... দিদির খুব জ্বর হয়েছে, আপনাকে একবার দেখতে চাইছে। আপনি কি আজ বা কাল একবার আসবেন আমাদের বাড়িতে? আমি সঙ্গে নিয়ে যাব—

হালকা ভাবটা ছেড়ে ইন্দ্রনাথ এবার নীরস গলায় বললেন, —আমার পক্ষে তো যাওয়া সম্ভব নয়। তোমার দিদির জ্বর কমলে... তার নাম কী?

— বিশাখা।

— বিশাখার জর কমলে তাকেই বরং একদিন নিয়ে এসো, সকাল সাড়ে ন-টার পর।

— স্যার, আর একটা বিশেষ দরকার———

ইন্দ্রনাথের পেটটা মুচড়ে উঠল। আর তো অপেক্ষা করা যাবে না। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, — আমার তো ভাই এখন আর কিছু শোনার সময় নেই।

কৃষ্ণাকেবললেন, — আমার এই নতুন শালাবাবুটিকে কিছু খেতে টেতে দাও।

খবরের কাগজটা তুলে নিয়ে তিনি রতনকে বললেন, — আমার চা-টা বাথরুমে দে।

ঠিক চল্লিশ মিনিট পরে তিনি বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে দেখলেন, ছেলেটি চলে গেছে।

তাঁর ভুরু একটু কুঁচকে রইল।

কেই তাঁকে ব্ল্যাকমেইল করতে চাইছে? এ ছেলেটি নয়, এর অত সাহস হবে না। এর আড়ালে অন্য কেউ? এত সহজ! ইন্দ্রনাথ বসু শক্ত মানুষ। পুরী যাওয়া, বিয়ে করা, এসব তিনি এক ফুঁয়ে উড়িয়ে দিতে পারেন। কারণ এর মধ্যে বিন্দুবিসর্গ সত্যি নেই।

কিন্তু বহরমপুরের কথাটা কী করে জানল?

গত সপ্তাহে তাঁর বহরমপুরের একটা অনুষ্ঠানে যাবার কথা ছিল ঠিকই, শেষপর্যন্ত যাওয়া হয়নি। কিন্তু তা বাইরের লোক কী করে জানবে? ওরা কি কাগজে কোনো বিজ্ঞাপন দিয়েছিল? হয়তো লোকাল কাগজে। উদ্যোক্তা সংস্থার প্রেসিডেন্টের স্ত্রী মারা গেছেন হঠাৎ, তাই অনুষ্ঠানটি পিছিয়ে গেছে অনির্দিষ্টকালের জন্য।

তাহলে বহরমপুর কিংবা ওই অঞ্চলেরই কোনো লোক? নাঃ, গুরুত্ব দেবার কোনো দরকার নেই।

কৃষ্ণা কারুর সঙ্গে টেলিফোনে লম্বা কথোপকথনে রত।

ইন্দ্রনাথ এবার বসলেন কমপিউটারের সামনে। গান ছাড়া তাঁর অন্য শখ ইন্টারনেট সার্ফিং। ওখানে বসে ব্রেকফাস্ট খাওয়া।

দুপুরবেলা তিনি আবার খাবার টেবিলে কৃষ্ণার সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পেলেন।

ইন্দ্রনাথ জিজ্ঞেস করলেন, —আমি বাথরুমে যাবার পর ছেলেটি আর কিছু বলল?

অন্যমনস্কভাবে কৃষ্ণা উত্তর দিল, — কোন ছেলেটি?

— ওর নাম তো জিজ্ঞেস করা হয়নি। যার দিদির নাম বিশাখা।

— ও হ্যাঁ। কী ব্যাপার বলো তো। সব কিছু বেশ রহস্যময় লাগছে।

— তুমি কি সত্যিই ভাবছ, গোপনে পুরীতে গিয়ে আর একটা মেয়েকে বিয়ে করে ফেলেছি?

— ওরকম উদ্ভট কথা ভাববে, আমি কি পাগল নাকি? তুমি লুকিয়ে লুকিয়ে অ্যাফেয়ার করতে পারো, কিন্তু বিয়ের মতন কাঁচা কাজ করবে না, তা আমি ভালোই জানি। সে-কথা হচ্ছে না। কিন্তু ছেলেটা এল কেন? তুমি বাথরুমে যাবার পর ওকে টোস্ট আর ওমলেট খেতে দেওয়া হল। তখন ও কী করল জানো? হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে বলল, 'দিদি আমায় ক্ষমা করুন, ক্ষমা করুন।' তারপর কিছু না খেয়ে দৌড়ে বেরিয়ে চলে গেল।

— স্ট্রেঞ্জ!

— স্ট্রেঞ্জ না স্ট্রেঞ্জার! কান্না ফান্না দেখলে আমার খুব খারাপ লাগে! কেনই বা এল। কিছু তো চাইলও না।

— হয়তো বুঝতে পেরেছে যে ভুল জায়গায় এসেছে!

এইসময় কৃষ্ণার একটা ফোন এল, এ - প্রসঙ্গ চাপা পড়ে গেল!

সন্ধের সময় আর একটি খুবই বিভ্রান্তিকর ফোন এল।

ইন্দ্রনাথ তা তুলতেই একজন বলল, — স্যার, আমি রফিক বলছি, আপনি আজ ক-টার সময় আসছেন?

রফিক নামে কারুকে চেনেন না ইন্দ্রনাথ। আজ কোথাও তাঁর যাবারও কথা নেই।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, — তুমি কে বলছ ভাই?

সে বলল, —আমি রফিক, চিনতে পারছেন না? কালই তো আলাপ হল।

ইন্দ্রনাথ বললেন, — কাল আলাপ হয়েছে? কোথায়?

—অলিম্পিয়ায়। আমার সাথে ইকবাল আর এতেশামও ছিল। আমরা বাংলাদেশ থিকা আসতাছি। আপনার সঙ্গে আলাপ হল, কত গল্প হল, আমাগো খুব ভালো লাগছে। আপনি আজ ফের আসতে বললেন।

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন ইন্দ্রনাথ। অলিম্পিয়া বারে তিনি, পুরীর মতনই, গত দশ বছরে একবারও যাননি। বার - টারে যাওয়া তিনিই ছেড়েই দিয়েছেন।

তারপর তিনি বললেন, —আমি তো ভাই কাল এক বন্ধুর বাড়িতে সন্ধের পর ছিলাম তিন ঘন্টা। অন্য কোথাও যাইনি। তুমি এ ফোন নাম্বার পেলে কোথায়?

— আপনিই দিয়েছেন।

— আমি দিয়েছি? আমার নাম কী?

— ইন্দ্রনাথ বসু। ফেমাস গায়ক। আমিও একটু - আধটু গানের চর্চা করি। আপনি অটোগ্রাফ দিলেন, একখানা গানও শোনালেন।

— তাই নাকি? কী গান শোনালাম?

— একখানা উচ্চাঙ্গের গান। ঠুংরি মনে হয়। ওয়ান্ডারফুল স্যার। ওয়ান্ডার ফুল।

— ঠুংরি! কোন ঠুংরি?

— আগে শুনি নাই, আপনিই বললেন, 'উস্তাদ বড়ে গোলাম আলি খান-এর বাজুবন্ধ্ খুল খুল যায়।'

ইন্দ্রনাথ স্তম্ভিত বোধ করলেন। তিনি প্রধানত খেয়াল গান করেন। কোনো কোনো ফাংশনে শ্রোতাদের অনুরোধে দু-এককানা ঠুংরিও শোনাতে হয়। তার মধ্যে বড়ে গোলাম আলির ওই গানটি তাঁর খুব প্রিয়।

এবার তিনি গম্ভীর গলায় বললেন, — যিনি তোমাদের গান শুনিয়েছেন, তিনি আজ আবার যাবেন কি না আমি জানি না। মোট কথা, সেই তিনি আমি না, আমার যাওয়ার কোনো প্রশ্নই নেই।

ফোন রেখে দেবার একটু পরেই আবার বাজল।

এবার একজন বলল, — ভালো আছেন তো স্যার? আমার নাম এতেশাম, আপনি কাল...

কথা শেষ না করতে দিয়ে ইন্দ্রনাথ বললেন, — রং নাম্বার।

ব্যাপারটা কী? একজন কেউ তাঁর নাম ভাঁড়িয়ে এইসব কাণ্ড করে বেড়াচ্ছে। তার চেহারা আমার মতন। সে আবার গানও গায়। এমনকী বড়ে গুলাম আলির ওই ঠুংরি? এখন ওই ঠুংরি আর বিশেষ কেউ গায় না!

আধঘন্টা পর আবার ফোন বাজতেই ইন্দ্রনাথের মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। বাংলাদেশের ছেলেরা সাধারণত নাছোড়বান্দা হয়। গতকাল নকল লোকটাকে ওরা গাইয়েছে? অনেক পয়সা খরচ করেছে?

তিনি রাগ করে কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, তার অগেই শুনলেন, 'আমি কড়েয়া থানা থেকে বলছি, আপনি মিস্টার বসু?'

ইন্দ্রনাথ বললেন, — ইয়েস!

লোকটি বলল, — আপনি আজ একবার এই থানায় আসতে পারবেন? বড়োবাবু আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে চান।

— আমাকে থানায় যেতে হবে? কেন? আপনার বড়োবাবু যদি কথা বলতে চান, ফোনে বলতে বলুন!

— ফোনে হবে না, আপনার একটা লিখিত স্টেটমেন্ট চাই!

— কীসের স্টেটমেন্ট?

সেটা জানলে তো আমি আগেই বলতাম। বড়োবাবু জানেন। আপনার নামে একটা কেস আছে। আপনি চলে আসুন না।

— কেস আছে মানে? আমি বিবাহিত লোক হয়েও পুরীতে গিয়ে ভুলিয়ে - ভালিয়ে অন্য একটা মেয়েকে বিয়ে করেছি, এই তো? রাবিশ!

— নো, নো, স্যার। ওরকম কিছু না। আমি যতটা জানি, আপনি অ্যাডভান্স টাকা নিয়েও গতকাল একটা ফাংশানে যাননি।

— বাজে কথা! গতকাল আমার কোনো ফাংশান ছিল না। কারুর কাছ থেকে টাকাও নিইনি! শুনুন, আমার একটা সামাজিক সম্মান আছে। হুট করে ডাকলেই আমি থানায় যাব? যদি বেশি গরজ থাকে, থানাকেই আমার কাছে আসতে হবে!

তিনি শব্দ করে ফোন রেখে দিলেন।

একই দিনে এসব কী কাণ্ড ঘটছে? তাঁর নামে আর একজন গায়ক আছে, সেও বিভিন্ন ফাংশানে গান গায়? কোনোদিন ঘুণাক্ষরেও তো তিনি এমন কথা শোনেননি। একই নামের দু-জন গায়ক থাকলে কি তা জানাজানি হত না?

টাকা নিয়ে গান না গাওয়ার ঘটনা ইন্দ্রনাথের জীবনে একবারই ঘটেছে। অনেকদিন আগে, তখন তাঁর রেট ছিল হাজার টাকা। পার্ক সার্কাস ময়দানে একটা বড়ো জলসায় তাঁর প্রোগ্রাম ছিল রাত সাড়ে আটটায়। তিনি উপস্থিত হয়েছিলেন ঠিক সময়।

কিন্তু উদ্যোক্তারা কিছুতেই তাঁকে মঞ্চে ডাকে না। একটার পর একটা অন্য আর্টিস্ট ঢুকিয়ে দিচ্ছে। ক্রমশ তাঁর বিরক্তি বেড়ে যাচ্ছিল। উদ্যোক্তাদের বারবার সেই একই কথা, 'আর স্যার মাত্র দশ মিনিট, এই বম্বের আর্টিস্টের পরেই।'

রাত সাড়ে বারোটা বেজে যাবার পর ইন্দ্রনাথ গান না গেয়ে রাগ করে চলে এসেছিলেন। পরে তিনি অ্যাডভান্সের টাকা ফেরত দিতে চাননি। তিনি তো কোনো দোষ করেননি, তাঁর অনেক সময় নষ্ট হয়েছে। উদ্যোক্তারা মামলা করার ভয় দেখিয়েছিল, তোয়াক্কা করেননি তিনি। আর কিছু হয়নি অবশ্য।

কতদিন আগে? বছর দশেক তো হবেই। দশ বছর?

দশ বছর আগে তিনি পুরীতে গিয়েছিলেন। কৃষ্ণা তখন প্রথম সন্তানের জন্ম দিয়ে বাপের বাড়িতে। সেখানে দুটি মেয়ের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল।

সিনেমা স্টারদের মতন অতটা না হলেও গায়কদের কাছাকাছিও অনেক যুবতী মেয়ে ঘুরঘুর করে। এই দুটি মেয়ের মধ্যে একজনের খুবই গদগদ ভাব, হাত ধরত, অন্যমনস্কতার ভান করে বুকের ছোঁয়া লাগাত। কিন্তু ইন্দ্রনাথ বেশিদূর প্রশ্রয় দেননি। তাঁর ভালো লাগছিল ঠিকই, কিন্তু সীমারেখা সম্পর্কে তিনি সজাগ।

মেয়েটি কি তাঁকে বিয়ে করতে চেয়েছিল? অতটা মনে নেই। অন্তত মুখে কিছু বলেনি।

দশ বছর আগে তিনি সন্ধেগুলো কোনো - না - কোনো বারেই কাটাতেন বন্ধুদের সঙ্গে। হ্যাঁ, অলিম্পিয়াতেও যেতেন। একবার কি একটি বাংলাদেশি দলের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল সেখানে? যতদূর মনে পড়ে, কয়েকটি উৎসাহী ছেলে...

দশ বছর আগেকার কিছু ঘটনা আজ আবার ঘটছে। অন্য কেউ ঘটাচ্ছে।

অথবা সবই কাকতালীয়া। দশ বছর আগের কোনোদিন কি ফিরে আসতে পারে নাকি? ধ্যাত!

কৃষ্ণা গেছে তার দিদির কাছে। ফিরল রাত পৌনে দশটায়। এর মধ্যে ইন্দ্রনাথ হুইস্কি নিয়ে বসলেন। বাড়িতে থাকলে সাধারণত তিনি তিন পেগ খান, এবং সেই সঙ্গে সিডিতে গান শোনেন। কত সহজে, কত রকম গান এখন পাওয়া যায়

আজ আর মদ্যপান থামাতে ইচ্ছে করছে না। একসময় খুব বেশিই পান করতেন , প্রায়ই ছ-সাত পেগ। বছর দশেক ধরে কমিয়ে দিয়েছেন।

কৃষ্ণা এগারোটার পর শুতে চলে যায়।

ইন্দ্রনাথ জেগে থাকেন আরো দু-তিন ঘন্টা। গান শোনেন, বই পড়েন। আজ কিছুতেই নেশা হচ্ছে না। ছ-পেগ হয়ে গেল। অনেকদিন পর। সারাদিনের ঘটনাগুলো মনে পড়ছে বারবার। যুক্তিতে মিলছে না কিছুতেই।

একসময় উঠে দাঁড়িয়ে পায়চারি করলেন ফ্ল্যাটের মধ্যে। ছেলেমেয়ে দুটি প্রতি শনিবার মামাবাড়িতে যায়, ওখানেই রাত্রে থাকে। কৃষ্ণা ঘুমন্ত, সমস্ত ফ্ল্যাট নিস্তব্ধ।

শরীরে যেন ফিরে এসেছে যৌবন। তিনি ফিরে গেছেন দশ বছর আগের বয়েসে।

তারপর তিনি আপনমনে হাসলেন। তা আবার হয় নাকি।

ঘুমোতে যাবার আগে একটুক্ষুণ টিভি দেখা তার অভ্যেস। কয়েকটা চ্যানেলে সারা দিনরাত্রি খবর দেখায়। বেশি রাতে খবর ছাড়া অন্য কিছু দেখারও থাকে না।

খবর দেখছেন ইন্দ্রনাথ। কোনো গুরুত্বপূর্ণ খবরই নেই। তিনি যখন টিভিটা বন্ধ করতে যাচ্ছেন, তখন দেখলেন, ব্রেকিং নিউজ : গাড়ি ও ট্রাকের সংঘর্ষ, বিখ্যাত গায়ক সাংঘাতিক আহত, জীবন - মৃত্যুর লড়াই।

গায়কটি কে? উচ্চাঙ্গসংগীত শিল্পী ইন্দ্রনাথ বসু। গাড়িতে খড়গপুর যাচ্ছিলেন, মুখোমুখি এক ট্রাকের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। গাড়ির সামনের সিটেই বসেছিলেন ইন্দ্রনাথ বসু। তিনি ও ড্রাইভার দু-জনেই কোমায় রয়েছেন।

ইনসেটে ইন্দ্রনাথের ছবি। তারই ছবি। ফাইল পিকচার, বোঝাই যায়।

আাবার ইন্দ্রনাথ হাসলেন। দশ বছর আগে এরকম একটা সাংঘাতিক দুর্ঘটনায় পড়েছিলেন ঠিক। খড়গপুরে নয়, তিনি যাচ্ছিলেন দুর্গাপুর, একটা ট্রাক এসে এমন ধাক্কা মারে যে গাড়িটা উলটে পড়ে যায় পাশের খাদে। সাতদিন ধরে যম তার প্রাণ নিয়ে টানাটানি করেছিল। পারেনি শেষপর্যন্ত। ইন্দ্রনাথের ঘাড়ে ও বুকে সেই দাগ রয়ে গেছে।

কিন্তু এখনকার টিভি চ্যানেল তো দশ বছর আগেকার ঘটনা দেখাবে না। আজই এই দুর্ঘটনা। ইন্দ্রনাথের নামে যে আর একজন লোক ঘুরে বেড়াচ্ছে, সে -ই আহত হয়েছে নিশ্চিত।

ইন্দ্রনাথ যেমন শেষপর্যন্ত বেঁচে গিয়েছিলেন, তার অনুকরণে এ-লোকটিও বেঁচে যাবে নিশ্চিত। আহা, বাঁচুক, বাঁচুক। নকল হোক যাই-ই হোক বাঁচুক।

নিজের মুমূর্ষু অবস্থার দৃশ্য দেখতে দেখতে ইন্দ্রনাথ আবার হাসলেন।